

## কবি-কথা

তিরিশ বছরেরও বেশী খুব কাছ থেকে কবিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। যা দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার দায়িত্ব আমার রয়েছে। যা দেখেছি তার স্মৃতি আমার নিজের প্রগল্ভতা থেকে আমাকে রক্ষা করুক, আমার বাক্যকে গৌরবমণ্ডিত করুক।

অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের কথা কবির লেখায় পাওয়া যায় তা সকলেই জানেন। কিন্তু যাদের সৌভাগ্য ঘটেছে কবিকে কাছে থেকে দেখবার তাঁরাই শুধু জানেন যে এই সব কথা কবির নিজের জীবনে কতখানি সত্য ছিল। আজ তিনি দূরে চলে গিয়েছেন, এখন আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে তাঁর কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, জীবনযাত্রার ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিসগুলির সঙ্গেও তাঁর লেখার গভীর মিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে আমরা দেখেছি তাঁর নিজের জীবনের মধ্যে, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। রবীন্দ্রসাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বস্তু। আজ সে আলোচনা নয়। যে পরম বিশ্বয়কর জীবনটিকে দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্মে আজ আমার এখানে আসা।

### বিশ্ববোধ

উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় খুব ছেলেবেলায়। এই মন্ত্রগুলি ছিল তাঁর জীবনের আশ্রয়। তাই তাঁর সাধনার মধ্যে দেখি উপনিষদের শাস্ত্র সমাহিত গভীর ভাব। কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কবির কাছে শুনেছি, আগে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র ছিল “শাস্তং শিবং অদ্বৈতম্”।

নিজের জীবনেও তাঁর পথ ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। একখানি চিঠিতে লিখেছেন :

“আমার কাছে ধর্ম ভারী concrete যদিচ এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকমে উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে,

গাছপালা, পশুপাখি ধুলোমাটি সব জিনিস থেকেই পেয়েছি।……আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তার স্পর্শ অনুভব করি। এক-একসময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

গানে কবিতায় বারে বারে বলেছেন :

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ।

পাকে পাকে ফেরে ফেরে

আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;

প্রভাত-সন্ধ্যার

আলো-অন্ধকার

মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;

অবশেষে

এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন,

আর আমার ভুবন ।

কতবার বলেছেন, “সোনালি রূপালি সবুজে স্থনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে।” হয়তো গাছের পাতায় আলো পড়েছে, গেয়ে উঠেছেন, “এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।”

বোলপুর বা কলকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারদিক বোদে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। বর্ষার সময়েও দেখেছি হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আসতে পারে “ঝুষ্টির স্বেদ বাতাস বেয়ে।” যখন বয়স কম ছিল, ফাল্গুনবৈশাখী মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোলপুরের খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাবছর বিকাল থেকে খোলা ছাতে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হ’ত তাতে তাঁর মন খারাপ হয়ে যেত। বলতেন, “ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।”

বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল করে দিত। তাই লেখবার সময় জানালার কাছ থেকে দূরে সরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানালা ছিল পূর্বদিকে—ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অল্প সব বড়ো

বড়ো গাছ। লেখবার সময় টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরানগরের বাড়িতে থাকতেন খুব ছোটো একটা কোণের ঘরে। সামনে একটা বড়ো জানালা দিয়ে পূব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট আম সুপুরির বাগান—তাই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন “নেত্রকোনা”। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানলার কাছ থেকে সরিয়ে এক কোণে, যেখানে ছপাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। বলতেন, “খোলা জানলার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।” যখন কাজকর্ম শেষ হয়ে যেত তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের আগে আমি প্রায় দু-মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি তখন থাকতেন অতিথিশালার দোতালায় পূবদিকের ঘরে। সবচেয়ে ছোটো এই ঘর। সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিমদিকের ঘরে। সে আমলে বাইরের লোকের আনাযাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। আশ্রমের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা একে একে চলে যেতেন। রাত হয়তো এগারোটা বাবেটা বেজে গিয়েছে, তখনো কবি অন্ধকারের মধ্যে চূপ করে বসে আছেন। আমি ঘুমোতে চলে যেতুম আবার সূর্য ওঠার আগেই উঠে দেখি কবি পূবদিকে মুখ করে ধ্যানে মগ্ন।

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পূবদিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন পিছনে দু-চারজন লোক। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু বললেন। “শান্তিনিকেতন” নামক বইয়ের অনেক ব্যাখান এইভাবে মুখে মুখে বলা।

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দেখেছি। শেষ বয়সে যখন রোগশয্যায় অজ্ঞান তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতেন কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়া বসিয়ে দাও।” যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করতেন পূবদিকের ঘর। যাতে প্রথম সূর্যের আলো এসে মুখে পড়ে। জানালা কখনো বন্ধ করতেন না। সূর্য ওঠার অনেক আগেই উঠে বসতেন, “শেষরাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটো-আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির

মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে। পারিনি তা নয়, কিন্তু একটু সময় লাগে।” আমরা বলেছি, “ক্লান্ত শরীরে আরেকটু শুয়ে থাকলে ভালো হয়।” বলেছেন, “দেখেছি যে শেষ রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তরূ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা বার্থ করতে ইচ্ছা হয় না। ছেলেবেলায় বাবামশায় রাত চার-টের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতে তখন ভাবতুম কেন আরেকটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।”

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার মজার ব্যাপার ঘটত। নরওয়েতে ওঁর শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর। মাঝে একটা ছোটো দরজা। প্রথম দিন সভাসমিতি অভ্যর্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় টক্‌টক্‌ করে আওয়াজ। কবি বলেছেন, “আর কত ঘুমোবে? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।” ঘরে চারদিকে কালো পর্দা টাঙানো। আলো জ্বলে ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। তখন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সূর্য ওঠে রাতদুপুরে। কবির ঘরেও কালো পর্দা টাঙানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। মাঝরাত্রে ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের জ্ঞান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেয়ে আমাদের ডেকে তুলেছেন। যাঁহোক ওঁকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম, যে তখন রাত তিনটা। নরওয়েতে ভোবের আলো দেখে ওঠা চলবে না। সকাল চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হ’ল।

কত কবিতার মধ্যে বলেছেন, “প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসঙ্গ  
পরশে অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।” বলেছেন :

হে প্রভাতসূর্য

আপনার শুভ্রতম রূপ

তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেঁরিব উজ্জ্বল,

প্রভাত-ধ্যানে রে মোর সেই শক্তি দিয়ে

করে আলোকিত...

ভোরবেলা যেমন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও সেই চূপ করে বসে থাকতেন। বলতেন, “সারাদিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি

একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই।” এর মধ্যে কোনে আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই যে প্রতিদিনের ধানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। ওঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূলা পাছে অল্প লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হ’ল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যাবেলা শাস্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে - পরে এ বাড়ির নাম হয় ‘প্রাস্তিক’। শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, “তুমি এখানেই থাকবে।” লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হ’ল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন “অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ”। বার বার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, “অন্ধজনে দেহ আলো”। বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে মন্দিরের পরে বললুম, “কাল তো আপনি সারারাত ঘুমাননি।’ একটু হেসে বললেন, “মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।”

### জীবন-দেবতা

কবি বার বার বলেছেন যে তাঁর জীবনে ছোটো বড়ো নানা ঘটনার মধ্যে তাঁর জীবন-দেবতার ইঙ্গিত তিনি দেখতে পেয়েছেন। অনেক কবিতায় আর গানে এই কথা পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি অনেকবার অনেক ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি অনেক সময়ে কবির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। প্রথমে মনে হয়েছে ভুল হ’ল, ক্ষতি হল কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে ভালোই হয়েছে।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের অল্পদিন পরেই কবির আগ্রহ হয় বিলাত যাওয়ার। ব্যবস্থা সমস্ত স্থির হয়ে গেল, কলকাতা থেকে সিটি-লাইনের

জাহাজে যাবেন। খুব ভোরে রওনা হওয়ার কথা। আগের দিন জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে অনেক লোক কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন। রাত দশটা বেজে গিয়েছে; চলে আসবার সময় কবিকে প্রণাম করে বললুম, “ভোরবেলায় তাহলে একেবারে জাহাজঘাটেই যাব।” কবি বললেন, “হাঁ তাই তো ব্যবস্থা” হঠাৎ মনে খটকা লাগল। পথে আসতে আসতে ভাবলুম যে, এ-কথা কেন বললেন যে “তাই তো ব্যবস্থা”। তবে কি যাওয়া নাও হতে পারে? রাত্রেই ঠিক করলুম পরের দিন জাহাজঘাটে না গিয়ে একটু আগে বাড়িতেই যাব।

খুব ভোরে, রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো নেবেনি, জোড়াসাঁকোর তিন-তলায় শোচার ঘরে গিয়ে দেখি যে কবির শরীর ভালো নেই। বিলাত যাওয়া স্থগিত। বিশেষ কিছু শক্ত অস্থখ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্তি আর অবসাদ। স্থির হল কিছুদিন কলকাতার বাইরে বিশ্রাম করবেন। এই সময় দীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্ম কতকগুলি বাংলা গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এইরকম করেই ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হয়। এর কিছুদিন পরে কবি বিলাতে গেলেন। তার, পরের কথা সকলেই জানেন। এই ইংরেজি গীতাঞ্জলির মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের বাইরে কবির বড়ো রকম পরিচয় শুরু হয়েছিল। আর এর জন্মই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ঠিক ঐ সময় বিলাত যাওয়া স্থগিত না হলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হ’ত কি না জানি না। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার সুযোগ ঘটবে বলেই সেদিন বিলাত যাওয়া বন্ধ হয়েছিল।

আবার অল্পরকমও হয়েছে। ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবি আচার্যের কাজ করবেন কথা হয়। কবির শরীর কিন্তু তখন অত্যন্ত অস্থস্থ। তার কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে বিলাত যাওয়া বন্ধ হ’ল—ওঁকে আমরা কলকাতায় ফিরিয়ে আনলুম। কলকাতায় আসবার পরে শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল—ডাক্তাররা লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলেন। ভাদ্রোৎসবের আগের দিনেও এই স্বকম অবস্থা। ধরে নেওয়া হ’ল যে, আচার্যের কাজ করতে পারবেন না। তবু উৎসবের দিন খুব ভোরে আমি ওঁর কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, “আমাকে নিয়ে চলো, আমি মন্দিরে যাব।” অনেক হাঙ্গামা করে নিয়ে এলুম। মন্দিরে সেদিন যে শুধু উপাসনার কাজ করলেন তা নয়, নিজে থেকেই গান ধরলেন “তুমি

আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।” আর ব্যাখ্যানের সময় গভীর বেদনার সঙ্গে, রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁর যা বলবার ছিল বললেন :

আজ যাকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আস্থান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজেকে আস্থান করেছিলেন। সেই আস্থানের মধ্যে রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সেই আস্থান ফুরোয়নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সতাকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে-সতাকে গ্রহণ করেনি। যতদিন না দেশ তাঁর সতাকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিনমজুরি দিয়ে জনতার স্বত্তিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না। রুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ।<sup>১</sup>

সেদিন খুব আবেগের সঙ্গেই সব কথা বলেছিলেন কিন্তু তার জ্ঞান শরীর একটুও খারাপ হয়নি। বরং দুপুরবেলা বললেন, “আজ সকালে মন্দিরে গিয়ে খুব ভালো হয়েছে। আমার শরীরও ভালো আছে।”

রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে শুধু তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তা নয় একটা আশ্চর্য রকম দরদও ছিল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা বলি। অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় কবি তখন বিলাতে। দেশ থেকে তাঁর কাছে সকলে চিঠি লিখছেন। দেশের লোকের ইচ্ছা কবি দেশে ফিরে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। কবি দেশে রওনা হলেন। আমরা খবর পেলুম যে, বসেতে একদিনও থাকবেন না। জাহাজঘাট থেকে সোজা গুভারলাগু মেলে সকালবেলা বর্ধমান হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন। কলকাতাতে আসবেন না। আগের দিন রাত্রে বর্ধমান চলে গেলুম, স্টেশনে রাত কাটল। ভোরবেলা, তখনো ভালো করে ফরশা হয়নি। ট্রেন প্রাটফর্মে এসে পৌঁছল। গাড়িতে উঠে প্রণাম করবার সময় দেখি কবির মুখ গম্ভীর। প্রথম কথা আমাকে বললেন “প্রশান্ত, রামমোহনকে যেখানে pygmy মনে করে সেই দেশে আমি ফিরে এলুম!” এতদিন পরে দেখা, এই হ’ল প্রথম সম্ভাষণ। তার পরে বললেন “আমি বিলেতে এঞ্জু সাহেব, স্মরেন, সকলের চিঠি পাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে, দেশে ফিরে আমার যদি কিছু কর্তব্য

থাকে তো তা করব। জাহাজেও সারাপথ নিজেই প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছি। বসেতে যখন জাহাজ পৌঁছল, দেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই একখানা খবরের কাগজ হাতে পড়ল। তাতে দেখি, রামমোহন রায় pygmy কেননা তিনি ইংরাজি শিখেছিলেন—এই হ'ল দেশের প্রথম খবর। তখন থেকে সে-কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারিনি।” সেদিন কবির মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলুম অসহযোগ আন্দোলনে ওঁর যোগ দেওয়া হবে না।

তার কারণ এর অল্পদিন পরেই ‘শিক্ষার মিলন’ আর ‘সত্যের আহ্বান’ নামে কলকাতায় যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্পষ্ট করে কবি নিজেই বলেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধো দিয়েই এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের সত্যিকারের মিলন। ভারতবর্ষ চিরদিন তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে সর্বমানবকে আহ্বান করেছে, তার আমন্ত্রণধরনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয়নি। রামমোহনও এই বাণীকেই বহন করে এনেছিলেন, আর ইংরেজি শিক্ষার মধো দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিখিলমানবের যোগসেতুটিকে নূতন করে রচনা করেছিলেন। কবি নিজেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার কথায় তাঁর মন সায় দিতে পারেনি।

আরেক দিনের ঘটনা বলি। বিশ্বভারতী যখন প্রতিষ্ঠা হয় সেই সময়কার কথা। বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলেছে। দেশের লোকের সকলের ইচ্ছা যে সে-সম্বন্ধে, বিশেষত কলকাতায় পুলিশের ধরপাকড লাঠি-চালানো সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নেতারা নিজে শাস্তিনিকেতনে গিয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন আর কবিও কিছু লিখতে রাজী হলেন।

সেইদিনই বিকালের গাড়িতে শাস্তিনিকেতনে পৌঁচেছি। তখন শীতকাল, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। শুনলুম কবি ‘দেহলী’র দোতালায় ছোটো ঘরে বসে ঐ লেখাটিই লিখছেন। উপরে উঠে দেখি ঘর অন্ধকার, কবি স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, “আজ কী কাণ্ড জানো? ওঁরা সব এসেছিলেন, অনেক কথা হ'ল, আমাকে রাজী করিয়ে গেলেন কিছু লিখতে হবে। কী লিখব মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলুম কিন্তু সমস্ত বিকালবেলাটা কুঁড়েমি করে কিছুতেই লিখতে বসি হ'ল না। তার পরে সন্ধ্যাবেলা ভাললুম যে, না, আর দেরি করা নয় এখনি লিখে ফেলি। লিখতে বসেও মনে মনে

সবটা আবার ভেবে নিলুম, ঠিক কোন্ কথাটা কোথায় কেমন করে গুছিয়ে বলব। কিন্তু কাগজ নিয়ে যেই কলম হাতে তুললুম হাত অবশ হয়ে এস। একটা কাঁকুনি দিয়ে আবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু হাত থেকে আবার কলম খসে পড়ল। আমার জীবনে কখনো এমন ঘটেনি। কলম কখনো আমার হাত থেকে খসে পড়েনি। তার পরে চুপ করে বসে আছি। বুঝলুম এ লেখা আমার দ্বারা হবে না।”

এই নিয়ে সকলে বিরক্ত হয়েছেন। অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে তাঁর বিধাতাপুরুষ সেদিন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এমন কিছু করা থেকে যা তাঁর অভিপ্রায় নয়।

বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটখাটো ঘটনাতেও এই একই জিনিস দেখেছি। কবে কোথায় যাবেন, কবে কী করবেন তা অন্য লোক তো দূরের কথা তিনি ঞ্জ্ঞেও কিছু বলতে পারতেন না। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে অথচ বারে বারে দেখেছি সব কিছু বদলিয়ে গেল। বিলাত যাওয়াই শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়েছে চার-পাঁচবার। এ তো তবু বড়ো ব্যাপার। একবার মাদ্রাজ মেলে রওনা হয়ে খড়গপুর থেকে ফিরে এলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাও ঘটেছে। একদিনের কথা মনে আছে। লোকজন জিনিসপত্র হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছে। হাওড়া-ব্রিজের সামনে রাস্তার পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বললেন, “গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।” আমরা ফিরে এলাম।

মনে আছে ১৯২৬ সালে বুড'পেস্ট শহর থেকে যেদিন রওনা হব। প্রথমে কথা হ'ল, যে. কনস্ট্যান্টিনোপল যাওয়া হবে—আমি পশ্চিমমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে জায়গা রিজার্ভ করলুম। একটু পরে বললেন, ওদিকে না গিয়ে, প্যারিসে ফিরে যাবেন। অবশ্য হৃদিক থেকেই তাগিদ ছিল। আমি তখন গাড়ি বদলিয়ে পূবমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ব্যবস্থা করলুম। তারপর আবার কনস্ট্যান্টিনোপল। আমরা যে হোটেলে ছিলাম তার একতলায় বুকিং আপিস। আমি তাদের বুকিয়ে বললুম, কবির ইচ্ছা, পূব আর পশ্চিম হৃদিকেই গাড়ি ঠিক করলাম। কবি যতবার মত বদলান, আমি অল্প একটু ঘুরে এসে বলি যে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য টেলিগ্রাম আর টেলিফোন প্যারিসে করতে হ'ল অনেকবার। বুডাপেস্ট শহরে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস হৃদিক থেকেই রাত দশটা আন্দাজ পৌঁছায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাত্রে খেতে

বসলুম। এমন সময়ে একজন দেখা করতে এসে ধরে পড়লেন যে, তাঁদের দেশে ক্রোয়াটিয়ার (Croatia) রাজধানী জাগ্রেব (Zagreb) শহরে যেতে হবে। পূর্ব বা পশ্চিম কোনদিকেই যাওয়া হোলো না। শেষ মুহূর্তে দক্ষিণদিকে জাগ্রেব-এর গাড়ি ধরলুম। খুব ভিড়। কবির খাতিরে অনেক কষ্টে সেদিন জায়গার ব্যবস্থা হ'ল। যাহোক, এইভাবে ঐদিকে যাওয়ার ফলে সেবার সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক এই সব দেশের লোকের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

এইরকম শেষমুহূর্তে বারে বারে ব্যবস্থা বদলিয়েছে। নিজেই বলতেন “তাকী করব। একটা ব্যবস্থা হয়েছে বলেই যে সেটা মানতে হবে এমন কি কথা আছে। ব্যবস্থা যেমন হতে পারে আবার তেমনি বদলাতেও তো পারে।” দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে তাঁর এক সঙ্গী একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন যে দ্বারকানাথ অনেক সময় হঠাৎ সমস্ত ব্যবস্থা বদলিয়ে দিতেন। তাই তাঁর সঙ্গী বলেছিলেন, “Baboo changes his mind”। শেষ বয়সে কবি এই চিঠিখানা পড়েন, আর তার পর থেকে কবি অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতেন “পিতামহ যা করেছেন পৌত্রও তো তা করতে পারেন। অতএব Baboo changes his mind !” .

খানিকটা হয়তো কবির খেয়াল। কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন যে তাঁর বিধাতা-পুরুষ বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটোখাটো ঘটনাতেও তেমনি করে কবির জীবনকে একটা কোনো বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়েছেন। ১৩১১ সালে ‘বঙ্গভাষার লেখক’ গ্রন্থে কবি একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিজে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কবির এরকম ধারণাও ছিল যে অনেক সময় বড়ো বিপদের আগে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ইঙ্গিত পেয়েছেন। যাকে ভবিষ্যৎ জানা বলে তা নয়। অনিশ্চিত কোনো বিপদ বা মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া ঠিক কী বিপদ তা না জেনেই। আমাকে একদিন বলেছিলেন যে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কবির সহধর্মিণীর মৃত্যু হয়, তার কয়েক মাস আগে নববর্ষের সময় কবির মনে হ'ল সামনে খুব বড়ো রকম একটা দুঃখ বা বিচ্ছেদ আসছে। কথাটা এমন স্পষ্ট-ভাবে মনে হয়েছিল যে, কবি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য।

নিজের সম্বন্ধেও অসুখ বা বিপদের কথা তাঁর আগে মনে হয়েছে দেখেছি। ১২৪০ সালে বর্ষাকালে কালিম্পং রওনা হওয়ার আগের দিন রাত্রে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি লালবাড়ির পশ্চিমদিকের কোণের ঘরে মুখ বিমর্ষ করে বসে রয়েছেন। বোর্ঠান (প্রতিমা দেবী) আগেই কালিম্পং চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্তু কবির যথেষ্ট আগ্রহ। অথচ মনে মনে একটা বাধাও অনুভব করছিলেন। আমাকে বললেন, “পাহাড়ে যেতে ভালো লাগছে না। এবার পাহাড়ে গেলে ভালো হবে না। কিন্তু এখন সব স্থির হয়ে গিয়েছে। বোমা চলে গিয়েছেন। এখন আর বদলাতে চাইনে। কিন্তু ভিতর থেকে একটা অনিচ্ছা।” পরের দিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার সময়ও দেখেছিলুম ওঁর মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। হয়তো ওঁর অবচেতন-মন অজ্ঞাত কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিল। কয়েকদিন পরেই কালিম্পং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই ওঁকে আমরা কলকাতায় নামিয়ে আনতে বাধা হলুম। এই তাঁর শেষ অসুখ।

১২৪১ সালে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন অপারেশন করার কথা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কবির একটুও মত ছিল না। পরে রাজী হয়েছিলেন। আমার নিজের বরাবরই অপারেশন করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। অপারেশন যেদিন করা হয় সেদিন সকালেও আমি দু-তিনজন ডাক্তারকে বলেছিলুম, যে, এখনো বন্ধ করা হোক। কিন্তু তার পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে রকম কাণ্ড চলেছে, আর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, নানা দিক দিয়ে যে রকম দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে এখন মনে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবি শেষ পর্যন্ত যে অপারেশনে মত দিলেন তাতে হয়তো ভালোই হয়েছে।

### দুঃখবোধ

তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল, “ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।” বলতেন, “ভালোমন্দ সব ছাড়িয়ে আরো বড় কথা হচ্ছে সত্য তাই তো আমাদের প্রার্থনা অসত্যো মা সদগময়। এতবড়ো প্রার্থনা আর নেই। প্রতিদিন নিজেকে বলি সত্য হও। যখন আত্মবিশ্বাস হই তাতে লজ্জা পাই, কারণ আমার সত্য-আমিটিকে তাতে ক’রে আবৃত করে দেয়। আমার প্রতিদিনের সাধনা তাকে আমি নির্মল ক’রে তুলব, সত্য ক’রে তুলব। নইলে আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।”

গভীর শোকের সময়েও যে শাস্ত থাকতে দেখেছি তার কারণ তাঁর এই সত্যদৃষ্টি। বলতেন, “জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। কষ্ট হয় মানি। কিন্তু মৃত্যু না থাকলে জীবনেরও কোনো মূল্য থাকে না। যেমন বিরহ না থাকলে মিলনের কোনো মানে নেই। তাই শোককে বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা শোকটাকে ঘটা করে জাগিয়ে রাখি পাছে যাকে হারিয়েছি তার প্রতি কর্তব্যের ক্রটি ঘটে। কিন্তু এটাই অপরাধ, কারণ এটা মিথো। মৃত্যুর চেয়ে জীবনের দাবি বড়ো।”

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ করতেন না। লিপিকা বইয়ের ‘কৃতঘ্ন শোক’, ‘সতেবো বছর’, ‘প্রথম শোক’, ‘মুক্তি’ এই সব যখন লিখছেন সেই সময়ের কথা মনে আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা জোড়াসাঁকোর তিনতলায় শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় কবির কাছে বসে আছি। পশ্চিমদিকের আকাশ তখনো লাল, নিচে চিংপুকের বাস্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনের গলিতে দু-একটা আলো জ্বলে উঠছে। দোতলায় যে-ঘরে কবি মারা যান ঠিক তার উপরে তিনতলায় ঐ শোবার ঘর ছিল মহর্ষিদেবের, তিনি ঐ ঘরেই মারা গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় ঐ ঘরে তাঁকে দেখতে আসতুম। দক্ষিণদিকের দেয়ালে টাঙানো থাকতো একটা গির্জার ছবি—তার ঘড়িটা ছিল আসল। কম বয়সে সেইদিকে অনেক সময়ে চোখ পড়ত। সে-আমলের শুধু ঐ একটা জিনিসই বাকি ছিল—মহর্ষির সময়কার আর কোনো জিনিস ঐ ঘরে ছিল না। কবিকে এই সব কথা বলছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেন :

“সদর স্ত্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুখ। কেউ ভাবেনি যে তিনি সেবার সেরে উঠবেন। এই সময় আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই বললেন—আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শাস্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মূর্তি বা ঐরকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অণুখা না হয়।”

কবি বললেন, “বুঝলুম মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনোরকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁর মন উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছিল।

বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।”

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ‘আমার এক-একসময় কী মনে হয় জানো? রামমোহন রায় খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন বিলাতে মারা গিয়ে। আমাদের দেশকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাঁকে নিয়েও হয়তো একটা কাণ্ড আরম্ভ হ’ত। তিনি আগে থেকে তার পথ বন্ধ করে গিয়েছেন। আমার নিজের অনেক সময় গনে হয়েছে আমিও যদি বিদেশে মারা যাই তো ভালো হয়।”

সদর স্প্লিটের বাড়িতে মহর্ষি যা বলেছিলেন তা এই একবার নয়, এর পরে কবি আরো দু-তিনবার আমাকে বলেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহর্ষির কোনো ছবি বা মূর্তি কখনো রাখা হয়নি, রাখা ‘নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়। জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনতলায় যে-ঘরে মহর্ষি মারা গিয়াছিলেন অনেকের ইচ্ছা ছিল যে এই ঘর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। মীরা আর রথীবাবুর কাছে শুনেছি এ নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু কবি কিছুতেই রাজী হননি। কবি এই ঘর অল্প সব ঘরের মতোই ব্যবহার করেছেন। সে ঘরে মহর্ষিদেবের ছবি পর্যন্ত রাখেন নি।

কবির নিজের কাছেও কখনো কারো ছবি বা ফটো রাখতে দেখিনি। ছবি সত্ত্বে যে কবির কোনো আপত্তি ছিল তা নয়। যে যখন চেয়েছে নিজের অসংখ্য ছবিতে নাম শই করে দিয়েছেন। আসলে ছবি কাছে রাখবার তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বোঁঠানের একথানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার ‘ছবি’-নামে কবিতাটি লেখেন। তাতে আছে;

সহস্রধারায় ছোটো তুরঙ্গ জীবন-নির্ঝরিণী

মরণেরে বাজায়ে কিঙ্কণী।

‘ছবি’ কবিতাটি লেখবার কয়েকদিনের মধ্যে এলাহাবাদে বসেই লেখেন ‘শাজাহান’ কবিতা যার মধ্যে আছে :

সমাধি-মন্দির

এক ঠাই রহে চিরস্থির ;

ধরায় ধূলায় থাকি  
 মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢাকি ।  
 জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?  
 আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে ।  
 তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে  
 নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ।

এ-সব কথা বারেবারে বলেছেন তাঁর লেখায় গানে কবিতায় । কিন্তু শুধু গান বা কবিতায় নয়, জীবনে তিনি কীভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন তাও দেখেছি বারেবারে ।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল । বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায় । জোড়াসাঁকোর কাছে স্বামী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে । কবি জোড়াসাঁকোয় । মেয়েকে দেখবার জন্ম রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই । কবি দোতলায় চলে যান । আমি নিচে অপেক্ষা করি । রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল । রোজ ঘেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম । সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি । কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন । তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, “আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে । দাঁড়ি দিয়ে ওঠবাব সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি ।”

গাড়িতে আর কিছু বললেন না । জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অল্পদিনের মতো আমাদের বললেন, “উপরে চলো ।” তিনতলায় শোবার ঘরে গিয়ে বসলুম । খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “কিছুই তো করতে পারতুম না । অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে । তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম । ছেলেবেলায় অনেক সময় বলত, বাবা গল্প বলো । অস্থতের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেলেবেলার মত বলত, বাবা গল্প বলো । যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম । এবার তাও শেষ হ’ল ।” এই বলে চুপ করে বসে রইলেন । শান্ত সমাহিত ।

সেদিন বিকালে ওঁর একটা কাজ ছিল । জিজ্ঞাসা করলুম, “আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে ।” বললেন, “না, বদলাবে কেন ? তার কোনো দরকার নেই ।” আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন

আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি। বললেন, “এরকম তো আগে আরো হয়েছে।” তার পরে তাঁর মেজোমেয়ে মারা যাওয়ার সময়কার কথা নিজেই বললেন।

সে সময় স্বদেশী আন্দোলন চলেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অস্থূথের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।

আর একটি শোনা কথাও এখানে বলি। কবির ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় মারা যায়। কবি শেষমুহুর্তে গিয়ে পৌঁছিলেন। মৃত্যুশয্যার পাশে গৃহকর্তা এমন অস্থির হয়ে পড়েন যে, সেদিন তাঁকে মাঝনা দিয়েছিলেন কবি স্বয়ং। তারপরে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন সে-কথা শুনেছিলুম জগদানন্দবাবুর কাছে। তার এল যে, কবি ফিরে আসছেন। আর কোনো খবর নেই। জগদানন্দবাবুরা ভাবলেন যে শমীকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সে আমলের বাহন গোরুর গাড়ি নিয়ে সকলে স্টেশনে গেলেন। কবি একা ট্রেন থেকে নেমে এলেন। ওঁর মুখ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। পরে জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন শমী মারা গিয়েছে। শান্তিনিকেতন ফিরে আসার পর সেদিনও কোনো কাজে কোথাও ফাঁক পড়েনি।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প দিন পরে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কবি বলেছিলেন :

“হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। হঠাৎ যখন অধরাতে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড অবির্ভাবের মহাক্ষণে যেমন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি। হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি। সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া রাখিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়...”

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি।... হে ভয়ংকর, হে

প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়ঙ্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অস্ত করণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উত্তত চেষ্টার দ্বারা অপরাঙ্জিত চিন্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব কিছুতেই কৃষ্টিত অভিজুত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্।”<sup>১</sup>

শমী মারা যাওয়ার সময় কবিকে কেউ বিচলিত হতে দেখেনি। অথচ তার অনেক বছর পরে শমীর কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে এল, তাও একদিন দেখেছি। কুড়ি-একুশ বছর আগেকার কথা। কবির তখন জ্বর. জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে। ছুটির সময়ে রথীবাবুবা কলকাতার বাইরে। বাড়িতে কেউ নেই। সন্ধ্যাবেলা গিয়ে দেখি বেশ রীতিমতো চেষ্টায় কবিতা আবৃত্তি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, “একটু জ্বর হয়েছে কিনা, তাই বোধ হয় মাথাটা উত্তেজিত আছে, কিছু চেষ্টায় পড়তে ইচ্ছে করছিল।” এই বলে লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনে পড়লো শমীন্দ্রের কথা। বললেন “শমীর ঠিক এইরকম হ’ত। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও খুব ছোটো। তখন থেকে ওকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম। ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতোই গান করতে পারত আর কবিতা ভালোবাসত। এক-একসময়ে দেখতুম চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা চেষ্টায় কবিতা আবৃত্তি করছে। এই রকম দেখলেই বুঝতুম যে ওর জ্বর এসেছে। ওকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিতুম। আমার এই বুড়োবয়সেও কখনো কখনো সেই রকম হয়।”

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শমীর ছেলেবেলার কথা বলতে লাগলেন। “ওর জন্ম অনেক কবিতা লিখেছি। শমী বলত, বাবা গল্প বলো। আমি এক-একটা কবিতা লিখতুম আর ও মুখস্থ করে ফেলত। সমস্ত শরীর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবৃত্তি করত। ঠিক আমার নিজের ছেলেবেলার মতো। ছাত্তের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াত। নিজের মনে কত রকম ছিল

ওর খেলা। দেখতেও ছিল ঠিক আমার মতো।” সেদিন দেখেছি শমীর কথা বলতে বলতে ওঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

আরো দেখেছি। কুড়ি বছর আগে, আলিপুরে হাওয়া-আপিসে তখন কাজ করি। কবি আমার ওখানে আছেন। কবির মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন বালিগঞ্জের বাড়িতে অত্যন্ত অসুস্থ। একদিন খবর এল যে অবস্থা খারাপ। কবি চলে গেলেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সঙ্গে যাইনি। খানিকক্ষণ পরে কবি ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর কিন্তু আর কিছু বোঝা যায় না। বললেন, শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পর ঘরে গিয়ে অল্পদিনের মতোই নিজের কাজে মন দিলেন।

তখন আমার বাড়িতে আরেকজন অতিথি ছিলেন—একজন ইংরেজ, সার গিলবার্ট ওয়াকার। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসতুম। সেদিন রাত্রে কবি নিজের ঘরে যদি আলাদা খেতে চান এই ভেবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম। বললেন, “না, তা কেন। একজন বিদেশী লোক রয়েছে। আমি খাবার ঘরেই আসব।” সেদিনও খাওয়ার টেবিলে কথাবার্তায় কোথাও ফাঁক পড়েনি। মনে আছে, খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধরে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা হ’ল। আমার বিদেশী অতিথি সেদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, “এর কথা অনেক দিন থেকে শুনেছি। লেখাও পড়েছি। আজ ওঁর একটা বড়ো পরিচয় পেলাম।”

আরেকদিনের কথা বলি। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাস। কবি আমাদের বরানগরের বাগান বাড়িতে। কবির একমাত্র নাতি নীতু তখন বিলাতে। খুব সাংঘাতিক অসুখে ভুগছে। অল্পদিন আগে মীরা (নীতুর মা) এগুজ সাহেবের সঙ্গে তার কাছে গিয়েছেন যতো শীঘ্র সম্ভব তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্ত। একদিন এগুজ সাহেবের চিঠি এল নীতুর অবস্থা একটু ভালো। তার পরের দিন ভোরবেলা কবি রানীকে বললেন, “যদিও সাহেব লিখেছেন যে নীতু একটু ভালো, তবু মন ভারাক্রান্ত রয়েছে।” তারপরে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। আর শেষে বললেন, “ভোরবেলা উঠে এই জানালা দিয়ে তোমার গাছপালা বাগান দেখছি আর নিজেকে ওদের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছি। বধায় ওদের চেহারা কেমন খুশি হয়ে উঠেছে। ওদের মনে কোথাও ভয় নেই। ওরা বেঁচে আছে এই ওদের আনন্দ। নিজেকে যখন

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখন সে কী আরাম। আর কোনো ভয়-ভাবনা মনকে পীড়া দেয় না। এই গাছপালার মতোই মন আনন্দে ভরে ওঠে।”

আমি এদিকে সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি, রয়টারের তার, নীতু মারা গিয়েছে। রথীবাবু তখন খড়দার বাড়িতে। তাঁকে ফোন করলুম। স্থির হ'ল তিনি এসে কবিকে খবর দেবেন। খানিকক্ষণ পরে রথীবাবু এলেন। দোতলায় কবির কাছে গিয়ে বললেন, “নীতুর খবর এসেছে।” প্রথমে কবি বুঝতে পারেননি। বললেন, “কি, একটু ভালো?” রবীন্দ্রনাথ বললেন, “না, ভালো নয়।” রথীন্দ্রনাথকে চূপ করে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন। তারপরে একেবারে স্তব্ধ। চোখ দিয়ে দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। আর কিছু নয়। একটু পরে রথীন্দ্রনাথকে বললেন, “বুড়ি (নীতুর বোন) একা রয়েছে, বোমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান। আমি কাল ফিরব তোর সঙ্গে।”

সকালে খানিকক্ষণ চূপ করে বসে রইলেন। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ নয়। সেইদিনই বসে বসে “পুকুরধারে” নামে কবিতাটি লিখলেন। ‘পুনশ্চ’ নামে যে বইটি নীতুকে উৎসর্গ করা তাতে ছাপা হয়েছে। পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেখানে তখন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলছে। অনেকে নীতু মারা গিয়েছে বলে উৎসব বন্ধ রাখবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি বর্ষামঙ্গল বন্ধ রাখলেন না। নিজেও পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময় মীরাকে একখানা চিঠি লেখেন :

সমস্ত ভুলচুক দুঃখকষ্টের মধো বড়ো কথাটা এই যে আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সখন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তাহলে সে অভাব হ'ত গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপর আবার কালের টানে যেতে হয়েছে। এমন বারবার হ'ল, বারবার হবে। এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলছে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে।...নীতুকে খুব ভালোবাসতুম, তাহাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখ করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। ...অনেকে বললে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্ আমার শোকের খাতিরে। আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব। ... আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি।

যেরাত্রে শমী গিয়েছিল সেরাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতু চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধ'রে বারবার ক'রে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। ...শমী যেরাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলের আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্তে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনোস্থত্রে যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ক্রটি না ঘটে। ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২।

এই ভাবেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তাই কবিতাতেও তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন :

দুঃসহ দুঃখের দিনে

অক্ষত অপরাঙ্কিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।

আসন্ন মৃত্যুর ঠায়া যেদিন করেছি অমৃতভব

সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।

তাই মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে

যাবো আমি চ'লে।

### দয়া ও করুণা

মানুষকে শুধু শুধু নিজের কাজে ব্যবহার করা এ জিনিষটা তাঁর কাছে ছিল বর্বরতা। বারবার বলেছেন, সভ্যতার ভিতরের কথা প্রয়োজনকে

ছাড়িয়ে আরো বড়ো কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা। যারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, দীনমজুর, বা চাকরের কাজ করে তাদেরও স্বথস্ববিধার দিকে তার দৃষ্টি ছিল। দুপুরবেলা চাকরদের কখনো ডাকতেন না। জ্ঞানতেন ঐ সময় হয়তো তারা একটু বিশ্রাম করে। অপেক্ষা করে থাকতেন তারা নিজেরা যতক্ষণ না আসে। বেশি কিছু দরকার হলে নিজেই যা পারেন করে নিতেন।

সব সময়েই চেষ্টা ছিল যারা কাছে আছে তাদের সকলের সঙ্গে একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা। শেষবয়সে তাঁর পরিচারক ছিল বনমালী। তাকে নিয়ে কতরকল হাসিঠাট্টা করেছেন, গান গেয়েছেন। একদিন রাত্রে খাওয়ার পরে দু-তিনজনকে গান শেখাচ্ছেন। বনমালী গুঁর জন্ম আইসক্রীমের প্লেট নিয়ে একবার এগিয়ে আসছে, আবার কাজের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেদিকে কবির চোখ পড়ল, আর হাত ঘুরিয়ে গান ধরলেন, “হে মাধবী, বিধা কেন, আমিবে কি ফিরিবে, কি, বিধা কেন?” সকলে হেসে অস্থির। বনমালী একেবারে দৌড়, এই রকম কত ব্যাপার ঘটত। আবার বনমালীর বাড়ি থেকে কোনো বিপদের খবর এলে অস্থির হয়ে উঠতেন যতক্ষণ না ভালো খবর আসে।

নিতান্ত সামান্য লোককেও কখনো অবজ্ঞা করেননি। তাঁর কাছে যে কেউ চিঠি লিখেছে, যতদিন সক্ষম ছিলেন, নিজের হাতে উত্তর দিয়েছেন। দেখা করতে এলে কাউকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। শরীর যতই অস্থির থাকুক, কাজের যতই ব্যাঘাত হোক তাতে আসে যায় না। একটা কিছু লিখছেন বা অল্প কাজে ব্যস্ত আছেন, আমরা কাউকে হয়তো ঠেকিয়েছি, খবর পেলে মনে মনে বিরক্ত হতেন। বারবার বলতেন, “আহা, আর তো কিছু নয়। আমার সঙ্গে একেবারে দেখা ক’রে যাবে। না হয় দুটো কথা বলবে। তার জন্তে এত হাজিমা কেন? এতেই যদি খুশি হয়, এটুকু কি আমি দিতে পারিনে।”

শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অসীম করুণা। বিশেষ ক’রে যাদের কেউ দেখবার নেই, যাদের কথা কেউ ভাবে না। শখ করে কখনো পাখি বা জানোয়ার পুষতে দেখিনি। কিন্তু নিরাশ্রয় জন্তু এসে গুঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে তা অনেকবার দেখেছি। শাস্তিনিকেতনে কবির ঘরের সামনে পাখিদের জন্তু জলের পাত্র ভরা থাকত। কবি রোজ নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। শালিখ পায়রা চড়াই কতরকম পাখি গুঁর আশেপাশে ঘুরে

খুঁটিয়ে খাবার খেয় যেত। কাকের দলও মাঝে মাঝে আসত। সে কথা স্মরণ করে 'আকাশপ্রদীপ' বইয়ের 'পাখির ভোজ' নামে কবিতায় লিখেছেন :

এমন সময় আসে কাকের দল,  
খাণ্ডকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।

...প্রথম হোলো মনে

তাড়িয়ে দেব, লজ্জা হোলো তারি পরক্ষণে  
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার।  
আমার মতোই সমান অধিকার।

তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,  
সকালবেলার ভোজের সভায়  
কাকের নাচের ছন্দ।

শান্তিনিকেতনে একটা ময়ূর ছিল। কেউ তাকে খাঁচায় পুরে রাখবার মতলব করলেই কবির চেয়ারের পিছনে এসে বসত। চাকরবাকবেরা চারিদিকে ঘুরছে, সে আর নড়ে না। কখনো কখনো কবি চাকরদের সরিয়ে দিতেন, বলতেন, "পাখিটাকে একটু নিস্তার দে।" তখন সে স্বচ্ছন্দমনে ঘুরে বেড়াত। এই ময়ূরটির কথাও আকাশপ্রদীপ বইএর আর একটি কবিতায় লিখেছেন।

শেষের দিকে একটা লাল রঙের কুকুর আসত, তার নাম দিয়েছিলেন লালু। এটা রাস্তার কুকুর। উঁচুজাতের তো নয়ই। কিন্তু রথীবাবুর দামী পোষা কুকুরের চেয়ে এর সম্বন্ধেই কবির দরদ ছিল বেশি। রোজ নিজের পাত থেকে একে খাওয়াতেন। কুকুরটাও ছিল মজার। কবির কাছে তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সংযত। যতক্ষণ কবির খাওয়া শেষ না হয় চূপ করে পিছন ফিরে বসে থাকত। খাওয়া হয়ে গেলে ওকে ডাকলে তখন খেতে আসত। কিন্তু কেউ যদি ওকে বলত হ্যাংলা কুকুর, লজ্জা নেই, খাওয়ার জগ্ন লোভ করছে, অমনি চলে যেত। কবি অনেক সময় আমাদের ভেকে বলেছেন, "রাস্তার কুকুর কিন্তু এর আছে আসল আভিজাত্য।" 'আরোগ্য' নামে বইতে এই কুকুরটির কথা লিখেছেন :

প্রতাহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর  
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে

যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার  
করস্পর্শ দিয়ে।.....

ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা  
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,

আমারে বুঝিয়ে দেয়— সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

কবির শেষ অস্থিরের সময়ে যখন উত্তরায়ণের দৌতলায় থাকতেন বলে দিয়েছিলেন যে লালু দৌতলায় এসে তাঁকে একবার করে রোজ্ঞ যেন দেখে যেতে পায়, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়।

আমাদের বাড়িতে যখন থাকতেন, দেখেছি যে আমাদের পোষা কুকুর কোনো ছুটুমি করেই ওঁর পায়ের কাছে বা চেয়ারের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। জানে যে সেখান থেকে আমরা টেনে এনে শাস্তি দিতে পারব না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য করেছেন যে আমরা বাইরে চলে গেলে কুকুরটি অস্থির হয়ে আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা করে। আমাদের বলতেন, “আমার ভারি খারাপ লাগে। তোমরা হঠাৎ কেন চলে যাও, কখন ফিরে এসো কিছু বোঝে না, মন খারাপ করে বসে থাকে। ওদের কিছু বোঝানো যায় না, অথচ ওরা কষ্ট পায় দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।”

যেসব গাছপালার কেউ যত্ন করে না তাদের প্রতি ছিল কবির বিশেষ টান। একসময়ে যখন শাস্তিনিকেতনে ‘কোণার্ক’ নামে বাড়িতে থাকতেন পিছনের একটা উঁচু জায়গা ঘিরে নিয়ে কাঁটাগাছের বাগান তৈরি করলেন। সেখানে নানা জায়গা থেকে নানারকম বুনো কাঁটাফুলের গাছ সংগ্রহ করে রাখতেন। নিজের হাতে এই গাছগুলিতে জল দিতেন, আর আমাদের ডেকে বলতেন, “কী সুন্দর সব কাঁটাফুল একবার চোখ তুলে দেখো।” বেশির ভাগ ফুলের নাম জানা নেই। কত নতুন নাম তিনি নিজে রচনা করেছেন—সোনাবুরি, বনপুলক, হিমবুরি, বাসন্তী। কবির লেখার মধ্যে এইরকম অনেক ফুল আর গাছের কথা আছে যাদের দিয়ে আর কোনো কবি কখনো গান রচনা করেননি। এইসব দেখে সহজেই বোঝা যায় যে মহাকবিরা যাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, যারা ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ তাদের কথাও রবীন্দ্রনাথ কেন স্মরণ করেছেন।

আসল কথা যারা সকলের কাছে ছোটো, যাদের সকলে অবজ্ঞা করে, কবির করুণা বিশেষভাবে তাদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। সংসারে যারা

অভাগা, যারা অত্যাচারিত তাদের জন্ম কবির মন চিরদিন পীড়িত। যৌবনেই প্রারম্ভেই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লিখেছিলেন :

...স্কীতকায় অপমান

অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষ্ক করিতেছে পান  
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস  
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।.....

...এই সব মূঢ় ম্লান মুখে

দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক  
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।....

গরিবদুঃখীদের কথা তিনি শুধু কবিতায় বলেননি। নানারকমে তাদের সাহায্য করেছেন। তাদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। জমিদারির কাজের মধ্যেও বারবার তাঁর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি। জমিদারির একটা অংশ ছিল শিলাইদার কাছে কুষ্টিয়ার পাশে। পাঁচ-ছয় বছর আগে আমরা একদিন কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে নৌকা করে হিজলাবট গ্রামে যাচ্ছি। মান্নির বেশ বয়স হয়েছে। বাড়ি কোণায় জিজ্ঞাসা করায় বললে যে, ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে। কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছে কিনা। যেই কবির নাম করা মান্নির মুখ উজ্জল হয়ে উঠল; বললে, "হ্যাঁ, দেখেছি বইকি। কতবার আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি। আর কাছারি-বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি। আহা! কী চেহারা। মানুষ তো নয়, দেবতা। সেরকম আর কখনো দেখব না। আর কী দয়া! যখনি ইচ্ছা সরাসরি তাঁর কাছে চলে যেতুম। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারত না। তাঁর হুকুম ছিল, সকলেই কাছে যেতে পারবে। আমাদের দুঃখের কথা যখনি যা বলেছি তখনি ব্যবস্থা করেছেন।"

এই সময়ে কবির একবার হিজলাবটে বেড়াতে যাওয়ার কথা হয়েছিল। এই খবর শুনে মান্নি বললে, "আহা একটিবার যদি তাঁকে দেখতে পেতুম। কবে তিনি আসবেন? আমাদের যেন নিশ্চয় খবর দেওয়া হয়—আমরা সকলে এসে আরেকবার তাঁকে দেখে যাব।" আশ্চর্য ব্যাপার! এই বুড়ো মুসলমান মান্নি চল্লিশ বছর আগে তাঁকে দেখেছিল, কখনো ভুলতে পারেনি। ওঁর

কথা শুনে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বারবার বললে, “অমন মানুষ দেখিনি। অমন মানুষ আর হয় না।”

কবিকে পরে এই মাঝির গল্প করায় খুব খুশি হলেন। বললেন, “ওরা সত্যিই আমাদের ভালবাসত। কম বয়সে যখন প্রথম জমিদারির কাজের ভার নিলুম তখনকার একজন খুব বড়ো মুসলমান প্রজার কথা মনে আছে। এক বছর ভাল ফসল হয়নি। প্রজারা খাজনা রেহাই পাওয়ার জন্ত এসেছে। আমি বুকলুম সত্যিই ছুববস্থা। যতটা সম্ভব খাজনা মাপ করতে বলে দিলুম। প্রজারা খুব খুশি হ’ল। কিন্তু এই বড়ো মুসলমান প্রজা আমাদের এসে বললে, ‘এত টাকা মাপ করছ, কর্তামশায় তো তোমাকে বকবে না? তুমি ছেলেমানুষ। ভেবে দেখো, বুঝেছো কাজ করো।’ সে আমাদের এত ভালোবাসত, যে, আমার জন্ত তার ভয় হ’ল পাছে আমার দাদারা আমাদের তিরস্কার করেন।”

কবি যে পরলীসংস্কারের কথা বারে বারে বলেছেন তার ভিতরের কথা হচ্ছে যে যারা গরিব দুঃখী চাষী তাদের জীবনকে কী করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। বিশ্বভারতীর মধ্যে শ্রীনিকেতনের কেন এতবড়ো জায়গা, কবিকে যারা জানতেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। বড়ো বড়ো আদর্শের কথা শুধু বইতে লেখেননি, কী করে সে-সব আদর্শ গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা যায় সারাজীবন সেই চেষ্টা করেছেন। যখন জমিদারি দেখতেন তখনো যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও তেমনি সেই একই চেষ্টা। যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন সমস্ত টাকা চাষীদের সাহায্য করার জন্ত রুশি-বাংলার কাজে লাগালেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর মন পড়ে ছিল কিসে দেশের সাধারণ লোক ভালো করে দুটি খেতে পায়। কিসে তারা ভালো করে থাকতে পারে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে একথা যেমন বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা। বড়ো বড়ো আদর্শ সম্বন্ধে কথার চাতুরীতে নিজেকে বা পরকে ভোলাননি। বরং তাঁর মনে একটা ভয় ছিল পাছে বড়ো বড়ো কথার ফাঁকে আসল কাজের জিনিসে ফাঁকি পড়ে। শেষ বয়সে তাই অনেক দুঃখে লিখেছিলেন :

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি  
 সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি ।  
 সাহিত্যের আনন্দের ভোজে  
 নিজে যা পারি না দিতে নিতা আমি থাকি তারি খোজে ।  
 সেটা সত্য হোক  
 শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ ।  
 সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি  
 ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্জুরি ।

### ধৈর্য ও উদারতা

মাগুষের সঙ্ঘকে ছিল আশ্চর্য ধৈর্য ও ক্ষমা । কারুর মতামত বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি । উপর থেকে কখনো কোনো চাপ দেননি । সব সময়েই চেষ্টা ছিল বুঝিয়ে বলে কিংবা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে কাজ করানো ।

তিরিশ বছর আগেকার কথা । আশ্রমের নিয়ম ছিল যে ছাত্র অধ্যাপক সকলেই ঘর আসবাবপত্র সমস্ত পরিষ্কার রাখবে । কিন্তু শিথিলতা ঘটত । একসময়ে কবি এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেন কিন্তু আশালুরূপ ফল হয়নি । এই রকম একটা সময়ে সকালবেলার গাড়িতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি । বিঠালয়ের ছোটো আপিসঘরটি তখন ছিল শালবীথিকায় । গিয়ে দেখি কবি নিজে একটা কাঁটা নিয়ে সমস্ত ঘর কাঁটা দিতে আরম্ভ করেছেন । সকলে অপ্রস্তুত । অনেকে ওঁর হাত থেকে কাঁটা নিতে এল । উনি তাদের বাধা দিয়ে বললেন, “আহা, তোমরা তো রেজাই করবে । আজ আমাকে করতে দাও ।” এই বলে আর কাউকে সেদিন কাঁটা ছুঁতে দিলেন না । নিজের হাতে খুব পরিপাটি করে সমস্ত পরিষ্কার করলেন । এই ছিল তাঁর ঠিক নিজের মনের মতো পন্থা । জোর করে নয়, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়ে কাজ করাতেই তিনি ভালোবাসতেন ।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের যা মূল আদর্শ, কোনো জায়গায় তার কিছুমাত্র স্থান না হয় সে সঙ্ঘকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল । এইটুকু বাঁচিয়ে চললেই যার যে রকম মত হোক না কেন তাতে বাধা দেননি । শান্তিনিকেতনের মধ্যে

কবির নিজের আদর্শের বিরুদ্ধে আলোচনা, এমন কি আন্দোলনও, অনেকবার হয়েছে। কবি যা ভালোবাসেন না তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে এমন কাজ বা আচরণ করা হয়েছে। আমরা অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি; বলেছি, “আপনার জোর করে বারণ করা উচিত।” কিন্তু রাজী করতে পারিনি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত সহ্য করেছেন। বলেছেন, “বাইরে থেকে জোর করে কিছু হয় না। জোর করে নিয়ম মানানো যায় এই পর্যন্ত। কিন্তু সে কতটুকু জিনিস? আসল কথা মানুষকে তার নিজের ভিতরের দিক থেকে বড়ো হতে দেওয়া।” বিশ্বভারতীর কর্মবাবস্থার সঙ্গে দশ বছর আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। দশ বছর কর্মদণ্ডের কাজ করেছি। অনেকবার মত্তভেদ ঘটেছে, বিরক্ত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কর্ম-পরিচালনা সম্বন্ধে একদিনও আমার উপরে জোর করে কোনো হুকুম জারি করেননি।

যারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, ক্ষতি করেছে, তাদের সম্বন্ধেও ছিল অদ্ভুত উদারতা। বাইশ-তেইশ বছর আগে একদিন বিকালে জোড়াসাঁকোয় লালবাড়ির দোতলায় বসে আছি। সে আমলের একজন নামজাদা সাহিত্যিক দেখা করতে এলেন। ইনি প্রকাশ্যভাবে কবির বিরুদ্ধে মাসের পর মাস অগ্নায় অপমানজনক বিদ্রূপ ও সমালোচনা করে এসেছেন। কলকাতায় কবির পঞ্চাশ বৎসরের জন্মোৎসবের সময়ে ইনি বিধিমতে বাধা দিয়েছেন। অনেক বছর কবির সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই এঁকে সেদিন আসতে দেখে আশ্চর্য হলুম। যা হোক, ইনি অল্প দু-চার কথা বলবার পরেই কবিকে জানালেন যে, তিনি একটা বার্ষিকী বের করছেন তার জন্ম কবির একটা নতুন লেখা চাই। কবির হাতে তখন একটা ভালো লেখা ছিল। যেই একথা শোনা তখনি সেই লেখাটা দিয়ে দিলেন।

এই ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পরে আমি কবিকে বললুম, “আপনি একেও লেখা দিলেন?” কবি একটু হেসে বললেন, “উনি বলেই তো আরো সহজে দিলুম। আমাকে সমালোচনা করেন, সে গুঁর ইচ্ছা। ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দাও করেন। হয়তো তাতে গুঁর খ্যাতি বাড়ে। হয়তো অগ্নদিকেও গুঁর সুবিধা হয়। কিন্তু এখন গুঁর নিজের দরকার পড়েছে তাই আমার কাছে এসেছেন। আমার একটা লেখা চাই। তা থেকে গুঁকে বঞ্চিত করি কেন? আমার তাতে কি এসে যায়?”

এরকম এক-আধবার নয়, অনেকবার ঘটেছে। একজন লেখকের কথা জানি যিনি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মুখে আনা যায় না এমন মিথ্যা কুংসা ছাপার অক্ষরে রটনা করেছেন। কবি তা নিয়ে মর্মান্ত হতে হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন পাছে এরকম ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ বিনা প্রতিবাদে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নজীর হয়। এই নিয়ে মানহানির মোকদ্দমা আনাতেও কবির অপমান এই ভেবে নিরস্ত হতে হয়েছে। অথচ পরে এই সাহিত্যকটিই যখন আবার কবির কাছে এসেছেন তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আরেকজনের কথা কবির নিজের কাছে শুনেছি। একসময়ে সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নানারকমে কবির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এই লোকটিকে কবি অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য করেছেন। বলতেন, “সাহায্য যখন করি তখন সব চেয়ে ভয় হয় পাছে তার জন্ত কোনো দাম ফিরে চাই।” তাই এই লোকটির শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাসিক দান বন্ধ করেননি।

সকলের ভালো দিকটাই দেখতে চাইতেন তাই সহজেই সকলকে বিশ্বাস করতেন। কবির নিজের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশে যেবার খুব বড়ো ভূমিকম্প হয় তারপরে রাজশাহী থেকে একথানা চিঠি পেলেন। একজন লিখেছে সে বিধবা, ভূমিকম্পে তার ঘরবাড়ি সব পড়ে গিয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে পথে দাঁড়িয়েছে। কবি তাঁকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে লাগলেন। পরে কী এক উপলক্ষে রাজশাহী যাওয়ার এই পরিবারের খোঁজ করেন। তখন জানা গেল যে ঐ ঠিকানায় আদৌ কোনো বিধবা মেয়ে থাকে না। এক নিরুর্মা যুবক ফাঁকি দিয়ে কবির টাকায় বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছে। এর পরেও কিছু হঠাৎ টাকা বন্ধ করলেন না। ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে তার একটা বাবস্থা করে দিলেন।

কবি বলতেন, মানুষ দোষ করে, অপরাধ করে। কিন্তু তাই বলে কাউকে চিরকালের মতো দাগী করে দেওয়া চলে না। মানুষকে কখনো অবিশ্বাস করতে চাইতেন না। তাই অনেকবার তাঁকে ঠকতে হয়েছে। তাঁর নিজের কাছে শুনেছি; স্ত্রীমারে পার হওয়ার সময়ে একবার একটি ছেলে কবি-গৃহিণীকে এসে বলে, যে তিনি তার আগের জন্মের মা। তার বড়ো সাধ যে সে বোজ সকালে মায়ের পাদোদক খায়। পূর্বজন্মের ইতিহাস হেসে উড়িয়ে দিলেও ছেলেটি জোড়াসাঁকোর সংসারে টিকে গেল। সে বললে, কলেজে ভর্তি

হয়েছে। খায় দায়, কলেজের মাইনে বই কেনার জন্ত টাকা নেয়। কবি তাকে তাঁর লাইব্রেরি দেখবার ভার দিলেন। কিছুদিন পরে অনেকগুলি বই আর খুঁজে পান না। মনে মনে একটু সন্দেহ হ'ল, কিন্তু নিজেই তাতে লজ্জিত হলেন। যা হোক ছেলেটিকে ডেকে বললেন, অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না ভালো করে যেন খুঁজে দেখে। সে বললে, খুব ভালো করে তদারক্য করবে। কয়েকদিন পরে এসে বললে যে, সে বুঝতে পেরেছে কেন বই হারাচ্ছে। কী ব্যাপার? সে তখন খুব গম্ভীরভাবে কবিকে জানাল যে, সুরেনবাবু স্বধীবাবু বনুবাবু এঁরা সব অবাধে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করেন। কবি প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে তাঁর ভাইপোদের লাইব্রেরিতে যাওয়ার সঙ্গে বই হারানোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে। পরে ইঙ্গিতটা বুঝলেন, আর এমন কথা কেউ মুখে আনতে পারে দেখে নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু কথাটা সুরেনবাবুদের জানালেন। তাঁরা ক্ষেপে অস্থির। খোঁজ করে দেখেন যে, ছেলেটি কলেজে ভর্তি হওয়া তো দুবের কথা এন্ট্রান্স পরীক্ষাই পাশ করে নি। আরো খোঁজ পাওয়া গেল পুরানো বইয়ের দোকানে কবির বই বিক্রি করছে—কতকগুলি বই উদ্ধারও হ'ল কিন্তু এর পরেও ছেলেটি যখন কবির কাছে “পিতা, অপরাণী” বলে দাঁড়াল তখন তাকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। এই ছেলেটিরও একটা বাবস্থা করে দিলেন।

এইরকম করে কত লোক যে ওকে ঠকিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ-সব ছিল একরকম ইচ্ছা করেই ঠকা। বলতেন, “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চাইনে। নিজে ঠকেও যদি মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বাস অটুট থাকে তবে সেই তো ভালো। নইলে যদি ভুল করেও কাউকে অবিশ্বাস করি তো সে কতবড়ো অন্ডায়। নিজের সামান্য ক্ষতি হ'ল কিনা এ-কথা তার কাছে কত তুচ্ছ।” আমাদের অনেকবার বলেছেন, “তোমরা বোঝো না। আমার সন্দিগ্ধ মন। জানো তো আমাদের বংশে পাগলামির ছিট আছে, আর পাগলামির একটা লক্ষণ হচ্ছে সন্দেহবাতিক, তাই তো আমাকে আরো বেশি সাবধান হতে হয় পাছে কারোর সম্বন্ধে অন্ডায় সন্দেহ করি। সন্দেহ আমার হয়। অন্ডা লোকের চেয়ে হয়তো বেশিই হয়, তাই বাবে বাবে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি।”

অনেক সময় লোকের উপর রাগ করতেন, বিরক্ত হতেন। কিন্তু কারোর সম্বন্ধে রাগ বা বিরক্তি বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারতেন না। বলতেন, “যখন

কারো উপরে রাগ করি তখন বুঝি যে আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি। তাতেই আমার লজ্জা। তাই চেষ্টা করি যত শীত্র পারি মন থেকে রাগ বিরক্তিরেড়ে ফেলতে।” ওঁর নিজের কাছেই একটা গল্প শুনেছি। মেজো মেয়ে যখন মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত তাকে আলমোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শরীর আরো খারাপ হওয়ায় তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরিয়ে আনা স্থির হ’ল। যানবাহনের অভাব। মেয়েকে ডাঙিতে চড়িয়ে অনেক দূরের পাহাড়ের পথ নিজে পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। ট্রেনে ফেরবার পথে, মাঝে কোন্ একটা স্টেশনে দেখলেন বেক্সির উপর থেকে দুশো টাকার বাগ চুরি গিয়েছে। হাতে পয়সা নেই, খুবই বিপদ। কবি বলেছিলেন, “প্রথমে ভারি রাগ হ’ল লোকটার উপর যে, এরকম ভাবে টাকা চুরি করল। তার পরে চুপ করে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, যে-লোকটা নিয়েছে তার হয়তো খুব টাকার দরকার। আমার চেয়েও হয়তো তার ঘরে আরো বড়ো বিপদ। তখন ভাবতে চেষ্টা করলুম যে, টাকাটা আমি তাকে দান করেছি। সে চুরি করেনি, আমি তাকে দিয়েছি যেই এ-কথা মনে করা, বাস, আমার রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল। মন শান্ত হ’ল।”

কবি বলতেন, “কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না এ হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের বিধি। ঈশ্বর কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তার শুধু একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—প্রকাশিত হও। সূর্যকে বলেছেন, পৃথিবীকে বলেছেন, মানুষকেও বলেছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাঁর শুধু এই আদেশ প্রকাশিত হয়!” তাই কোনো বিধিনিষেধের দিক দিয়ে কবি কখনো কোনো মানুষকে বিচার করেননি। মানুষকে দেখতেন ঠিক মানুষ হিসাবে। কোনো গুচিবাই তাঁর ছিল না। কবির লেখায় এই কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন ‘ব্রাহ্মণ’ কবিতায়।

তাই দেখেছি নিঃসংকোচে তাঁর কাছে এসেছে এমন সব লোক যাদের নীতিবাগীশেরা দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কোনোরকম মিথ্যা, কোনোরকম ক্ষুদ্রতা নীচতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করলেই কাউকে বর্জন করবে তা কখনো মনে করেননি। পিতামাতার সামাজিক অপরাধের জন্ত তিনি ছেলেমেয়েদের কখনো অপরাধী করেননি। বলতেন, “মানুষ ভুল করে এ-কথা সত্য। কিন্তু এইটাই সবচেয়ে বড়ো কথা

নয়। কে কী ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে তার চেয়ে বড়ো কথা কে কী রকম লোক।”

সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। বিশ্বভারতী থেকে কলকাতায় একটি অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। একটি মেয়ে খুব ভালো অভিনয় করতে পারে। কবি তাকে ডেকে পাঠালেন। নিজের নাটকে অভিনয় করার জ্ঞান বললেন, আর কয়েকদিন ধরে তাকে গান আর অভিনয় শেখালেন। মেয়েটির কিন্তু সমাজে অত্যন্ত নিন্দা, সে অপাংক্তেয়। তার সঙ্গে অভিনয় করায় অনেকের ঘোর আপত্তি। বাধা হয়ে তাকে বাদ দিতে হ'ল। কবি কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। আমাকে বললেন, “দেখো, মাহুষের যেখানে সত্যিকারের ক্ষমতা আছে সেখানে সে বড়ো। মাহুষের বড়ো দিকটাও যদি আমরা না নিতে পারি সে আমাদের দুর্ভাগ্য। আমার তো একে নিয়ে অভিনয় করতে কিছু বাধে না। কিন্তু কী করব, উপায় নেই। সকলের যখন আপত্তি, আমি একা কী করব?” মেয়েটিকে ডেকে এনে যে বাদ দিতে বাধা হলেন এ দুঃখ তাঁর কোনোদিন ঘোচেনি।

‘লাবরেটরি’ নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়, কবি তখন অসুস্থ, অল্পদিন আগে তাঁকে কালিপ্পম্পু থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিকালবেলা গিয়ে শুনি, যে, দুপুর থেকে আমাকে খুঁজছেন। আমি যেতেই গল্পটা দেখিয়ে বললেন, “পড়েছ?” আমি বললুম, খুব ভালো লেগেছে। এ রকম জোরালো গল্প কম আছে।” বললেন “হাঁ, তোমার তো খুব ভালো লাগবেই। কিন্তু আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে এটা লেখা ওঁর উচিত হয়নি?” একটু হেসে বললেন, “আমি ইচ্ছা কবেই তো করেছি। সোহিনী মাহুষটা কীরকম, তার মনের জোর, তার লয়লটি, এই হ'লো আসলে বড়ো কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাৎ—সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।”

মাহুষের মন, এই ছিল তাঁর কাছে আসল জিনিস। বাইরের রীতিনীতি সব সময়েই গোপ। লেখা হয়নি এমন একটা নাটকের কথা বলি। কবির

কাছে শুনেছি, যে সময় 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখছেন তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল। যদুবংশের মেয়েদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলি লেখা ঐ ভাবে হওয়ায় এটাতে আর হাত দেননি। অনেকদিন পরে 'রাজা' আর 'অচলায়তম' যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একটা গল্প নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বললেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর যদুবংশের সব বীরেরা বড়ো বড়ো, যুদ্ধ, বড়ো বড়ো কথা আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে বাস্তু, মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় নেই। মেয়েরা আছে শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে অনার্য দস্যুরা হ'ল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হ'ল। মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নষ্ট করল—যাতে দস্যুরা তাদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যুদের ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন তাঁর গাঙীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা লেখা হয়নি। পরেও মাঝে মাঝে এই নাটকের কথা বলেছেন আর সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছেন, "এই নাটক লিখলে সকলে চটে যাবে, কেউ আমার রক্ষা রাখবে না।"

### বিশ্ব-মানব

বিশ্ব-মানবের আদর্শ কবি তাঁর লেখায় বক্তৃতায় দেশে দেশে প্রচার করেছেন। কিন্তু শুধু মুখের কথায় তা আবদ্ধ ছিল না। নিজের ঘরে কোনো বিদেশী অতিথি এলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠত। তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। প্রত্যেকের জন্ত একটা দেশী নাম তৈরি করতেন। নরওয়ে থেকে এলেন অধ্যাপক কোনো (Konow) তাঁর নাম হোলো কথ। ডেনমার্ক থেকে একটি মেয়ে এল তাঁর নাম দিলেন হৈমন্তী। কেউ বা বাসন্তী, এই রকম কত কী। বিদেশেও দেখেছি বাবে

বারে বলেছেন, “অল্প দেশের লোকেরা যখন আমার কাছে আসে, আমাকে ভালোবেসে কিছু দেয়, হয়তো আমার একটু সেবা করে তখন সব চেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে আমি মাহুষ—সার্থক আমার মানবজন্ম।” তাই লিখেছেন :

জন্মবাসরের ঘটে

নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি

করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে ।

একদা গিয়েছি চিন দেশে

অচেনা যাহারা

ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব’লে ।...

অভাবিত পরিচয়ে

আনন্দের বাঁধ দিল খুলে ।

ধরিয়া চিনের নাম পরিহ্ন চিনের বেশবাস ।

এ-কথা বুঝিহ্ন মনে

যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে । — জন্মদিনে

শুধু কি বিদেশী মাহুষ ? দক্ষিণ-আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলেন :

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম —

কী তোমার নাম,

হাসিয়া ছালালে মাথা, বুঝিলাম তবে

নামেতে কী হবে ।

আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয় ।...

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমাতে শুধাই, বলো দেখি,

মোরে ভুলিবে কি ?

হাসিয়া ছালাও মাথা ; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে

পড়িবে যে মনে ।

দুইদিন পরে

চলে যাব দেশান্তরে,

তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা ;—

মোরে ভুলিবে না ।

— পূর্ববী

গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, “কত অজ্ঞানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।” এ-কথা তাঁর নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কবির সঙ্গে মাঝিয়ারা থেকে বুলগেরিয়া যাচ্ছি। গভীর রাত্রে সীমানার কাছে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে – বেশি ঠাণ্ডা নয়, আমাদের দেশের শীতকালের রাতের মতো। হঠাৎ শুনি কবির গাড়ির পাশে কে এসে বাঁশি বাজাচ্ছে তাঁকে শোনার জন্য। অজ্ঞানী স্বর, কিন্তু তার মধ্যে দেশী স্বরের বেশ। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল বাঁশি তখনো থামেনি। কে বাজাল, কী তার পরিচয় জানি না। কবির সঙ্গে তার দেখাও হ’ল না। কবি তার বাঁশি শুনলেন এই শুধু তার পুরস্কার।

বিদেশের ভালো দিকটা সর্বদা দেখেছেন কিন্তু গায়ের জোরে কেউ বিশ্বমানবের পথ রোধ করে দাঁড়াতে তা কখনো সম্বন্ধ করেননি। ১৯২৬ সালে মুসোলিনির নিয়ন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে ফ্যাসিস্ত তন্ত্রের ভালো দিকটাই শুধু তাঁকে দেখানো হ’ল। দিনরাত ঘিরে রইল শুধু গোর্ডা ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা। নিজের লেখায় কবি মুসোলিনির প্রশংসা করলেন। ইটালি থেকে বাইরে যাওয়ার পরে অল্প দিকের কথা শুনতে পেলেন। প্রথমে ভিলনিউভ-এ দেখা হ’ল রোমাঁ রোলঁ আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হলো মাদাম সালভাডোরি (Madam Salvadori), মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini), আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ্ (Angelica Balbanoff), এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কী করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বার বার করে লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহাৰনিত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিউভ থেকে জুরিক্ সেখান থেকে ইনস্ক্রক তার পরে ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিসে নিয়ে গেলাম। যুরোপের সব চেয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা দেখলেন। কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তার পরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন, তখন শান্ত হলেন। শরীর মন দুই ভালো হয়ে গেল।

শেষ বয়স পর্যন্ত ঠিক এই রকম। জার্মানি যখন নরওয়ে আক্রমণ করে, সন্ধোবেলা শান্তিনিকেতনে রেডিয়োতে খবর পৌঁছিল। শুনে গুঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, বললেন, “অম্বররা আবার নরওয়ের ঘাড়ে পড়ল—ওরা কাউকে বাদ দেবে না।” তার পরে কয়েকদিন ধরে বারে বারে আমাদের বলেছেন, “নরওয়ের লোকজনের কথা মনে পড়ছে আর আমার অসহ লাগছে। তাদের যে কী হচ্ছে জানিনে।”

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পঙ থেকে ওকে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে আনলুম। তার কয়েকদিন পরের কথা। শরীর তখনো এমন দুর্বল যে, ভালো করে কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যায়। একদিন খবর পেলুম আমাকে বার বার ডেকেছেন। কিন্তু পৌঁছতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল। আমাকে দেখেই বললেন, “অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি, চীনদেশের লোকেরা যে যুদ্ধ করছে”—বলতে বলতে কথা জড়িয়ে এল। থেমে গেলেন। বললেন, “এত দেরি করলে কেন? যা বলতে চাচ্ছি বলতে পারছি। একটু আগে কথাটা খুব স্পষ্ট ছিল, এখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।” বুঝলুম, কিছু বলবার জ্ঞান মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রুগ্ন শরীরে এতটা উত্তেজনা সহ্য হয়নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পাশে বসে অপেক্ষা করলুম। তখন থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা কথায় বলে গেলেন :

“চীনদেশের লোকেরা চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরতা মনে করেছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে দানবরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের গৌরব। ওরা যে অগ্নায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে এই হ'ল বড় কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওরা যে অত্যাচার সহ্য করেনি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এতেই ওরা অমর হয়ে থাকবে।”

বুঝলুম কী বলতে চান। ‘নৈবেদ্য’র কবিতায় অনেকেদিন আগে লিখেছিলেন :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা  
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা  
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম  
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়গ মম  
তোমার ইঙ্গিতে।

আশি বছর বয়সে, জীর্ণ শরীরে, কঠিন রোগের সময়েও ভুলতে পারেননি চীনদেশে কী কাণ্ড চলেছে। বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা নেই, তখনো ভুলতে পারেননি যে অন্ধ্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। শেষবয়সেও লিখছেন :

মহাকাল সিংহাসনে

সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে

কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী ।...

মৃত্যুর তিন মাসে আগেও ‘সভ্যতার সংকটে’ লিখেছেন :

“আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্বপ্ন। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক’রবো। আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাঙ্কিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক’রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্ঘাদা ফিরে পাবার পথে।

শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অস্থখের মধ্যেও বারে বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্ত। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : “রাশিয়ার খবর বলো।” বললুম, “একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।” মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, “হবে না? ওদেরইতো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।”

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, যে, সেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।

১৯৪২, ২ই আগষ্ট, রবিবার কবির মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মুখে বলা হয়। পরে পরিবর্তিত আকারে লেখা।